**দুর্নীতি দমনে সরকার ও জনগণের সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন**

রকীবুল হক

বর্তমান বিশ্বে আলোচিত ও অত্যন্ত পরিচিত একটি শব্দ হচ্ছে-‘দুর্নীতি’। বিশ্বজুড়েই দুর্নীতিকে মারাত্মক সামাজিক সংকট ও সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। সাধারণত, নীতিকে বিসর্জন দিয়ে অবৈধ ও অন্যায়ভাবে কোনো সম্পদ অর্জন, কাজ, বা অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা লাভ করাকে দুর্নীতি বলা হয়। আদিকাল থেকেই কিছু মানুষের মাঝে দুর্নীতির প্রবণতা বিরাজ করছে। এটি বর্তমানে বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম বাধা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর এক জরিপে দেখা গেছে, পৃথিবীব্যাপী প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ইউ এস ডলারের দুর্নীতি হয়। ২০১৭ সালে “আসুন দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হই” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালনের লক্ষ্যে দুর্নীতিদমন কমিশন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়। জাতিসংঘে ২০০৩ সালে ৯ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। দুর্নীতিদমন কমিশন ২০০৭ সাল থেকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন শুরু করে। দুর্নীতিদমন কমিশন প্রতিবছর দিবসটি পালন করলেও দেশে সরকারিভাবে দিবসটি পালিত হতো না। এ প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমন কমিশন ০৯ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালনের অনুরোধ জানিয়ে ২০১৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে পত্র প্রেরণ করে। তৎপ্রেক্ষিতে সরকার ১৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে ০৯ ডিসেম্বর তারিখকে ‘আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস’ ঘোষণা করে।

সারাবিশ্বে দুর্নীতিবিরোধী নানা পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও এর বিস্তার যেন থামছেই না। দুর্নীতি বিস্তারের কারণ এবং দুর্নীতির প্রকৃতি ও ধরণ একেক দেশে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই দুর্নীতি দমন বা প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে নিজস্ব কৌশল বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এজন্য নানা আইন ও নীতিমালাও প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। দুর্নীতিবাজদের সংখ্যা নগন্য হলেও এর ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত।

দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো আদর্শের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অসাধুতা বা বিচ্যুতিকে ‘দুর্নীতি (ইংরেজি: Corruption) বলা হয়। বৃহৎ পরিসরে ঘুষ প্রদান, সম্পত্তির আত্মসাৎ এবং সরকারি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করাও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।’

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তথা বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে টানা পাঁচ বার দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকার এক নম্বরে ছিল বাংলাদেশ। বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদে দুর্নীতির সূচকের বেশ উন্নতি হতে দেখা গেছে। টিআইয়ের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৮ সালে দুর্নীতির সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩ তম। শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ছিল ১৭ তম অবস্থানে।

এছাড়া টিআইয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় ২০০৬ সালে তৃতীয়, ২০০৭ সালে সপ্তম, ২০০৮ সালে দশম, ২০০৯ সালে ১৩তম, ২০১০ সালে ১২তম, ২০১১ সালে ১৩তম, ২০১২ সালে ১৩তম, ২০১৩ সালে ১৬তম, ২০১৪ সালে ১৪তম, ২০১৫ সালে ১৩তম, ২০১৬ সালে ১৫তম অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের পরিসংখ্যানে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে সোমালিয়া। তার পরেই রয়েছে সিরিয়া ও দক্ষিণ সুদান। তৃতীয় অবস্থানে ইয়েমেন ও উত্তর কোরিয়া। আর সবেচয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ বিবেচিত হয়েছে ডেনমার্ক। কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে এর পরেই রয়েছে নিউজিলল্যান্ড। এ তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয় আফগানিস্তানে। এরপরই বাংলাদেশের অবস্থান।

দুর্নীতির বিভিন্ন কারণ থাকলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করেই সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়ে থাকে। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে ক্ষমতা দখলের জন্য একশ্রেণির মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকার, প্রশাসন বা রাজনৈতিক দলের মদদে দুর্নীতি হয়ে থাকলেও দুর্নীতিবাজদের প্রধান লক্ষ্য থাকে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করা। কতিপয় দুর্নীতিবাজের দুর্নীতির কারণে সমাজ বা রাষ্ট্রের সবাই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

অবৈধ স্বার্থ লাভের জন্য যেমন কেউ কেউ দুর্নীতির আশ্রয় নেয় তেমনি পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে সাধারণ কাজ-কর্মেও দুর্নীতি করতে বাধ্য হন অনেকে। এজন্য টেন্ডার, চাকরিতে নিয়োগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, বিভিন্ন পরীক্ষা বা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতির খবর পাওয়া যায়।

দুর্নীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে-নীতিনৈতিকতা ও আদর্শ বিবর্জিত রাজনীতি, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের অভাব, মানুষের আয়-ব্যয়ের ভারসাম্যহীনতা, বৈষয়িক অর্থনৈতিক প্রভাব, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য এবং শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা ও স্বজনপ্রীতি, অতিলোভ, উচ্চাভিলাষ, বিলাসিতাপূর্ণ মানসিকতা ও সম্পদ আহরণে অসম অন্যায় ও প্রতারণামূলক প্রতিযোগিতা, কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতন কাঠামো নির্ধারণ না করা, মেধা, যোগ্যতা ও কর্মের যথাযথ মূল্যায়নের অভাব, সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে বেতন বৈষম্য, দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকা এবং তাদের ঘৃণার চোখে না দেখা ইত্যাদি। এজন্যই দেশ ও সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে অবশ্যই এসব অসঙ্গতির সমাধানে বেশি মনযোগ দিতে হবে।

-২-

বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির কথা কঠোরভাবে ঘোষণা করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। সে অনুযায়ী কাজও চালাচ্ছে সরকার।

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতিহারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-‘দুর্নীতি একটি বহুমাত্রিক ব্যাধী। পেশিশক্তির ব্যবহার ও অপরাধের শিকড় হচ্ছে দুর্নীতি। যার ফলে রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে অবক্ষয় বা পচন শুরু হয় এবং অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন প্রভৃতি কোনো ক্ষেত্রেই ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না। দুর্নীতি দমনে রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ মুখ্য হলেও তা শুধু সরকারের দায় নয়, জনগণেরও দায় রয়েছে। আমরা মনে করি, দুর্নীতি দমনে প্রয়োজন সরকারের পাশাপাশি জনগণের সমন্বিত পদক্ষেপ।’

নির্বাচনী ইশতিহারের অঙ্গীকার অনুযায়ী দুর্নীতির বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে সবচেয়ে বড়ো বাধা হিসেবে দেখছে সরকার। দুর্নীতিবাজ যে দলেরই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে ‘অ্যাকশনে’ যাওয়ার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের এ অবস্থান দেশের সর্বস্তরের মানষের মাঝে বেশ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষে সরাসরি কাজ করছে ‘দুর্নীতি দমন কমিশন’ বা দুদক। ১৯৫৭ সালের দুর্নীতি দমন আইন অনুসারে ২০০৪ সালের ৯ মে গঠিত এ প্রতিষ্ঠানটির রুপকল্প হচ্ছে-‘সমাজের সর্বস্তরে প্রবাহমান একটি শক্তিশালী দুর্নীতিবিরোধী সংস্কৃতির চর্চা এবং এর প্রসার সুনিশ্চিত করা’। দুদকের লক্ষ্য হচ্ছে-‘অব্যাহতভাবে দুর্নীতির দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ সাধন করা’। এছাড়া তিনটি কৌশলগত লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে এ প্রতিষ্ঠানটি। তা হচ্ছে-শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন; বিদ্যমান কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা; এবং শিক্ষা ও উত্তম চর্চার বিকাশ ও সচেতনামূলক প্রচারের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে দুদক। এছাড়াও বাংলাদেশে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির তথ্য সরবরাহকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি নতুন আইনের খসড়া মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে, আইনটি ‘তথ্য সরবরাহকারীর সুরক্ষা আইন’ নামে অবিহিত করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন বা প্রতিরোধে সরকারিভাবে আইনের প্রয়োগ বা শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি জনসাধারণেরও বিশেষ ভূমিকা প্রয়োজন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কোথাও দুর্নীতিবাজদের যেমন প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না, তেমনি কাউকে দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতিকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। কারণ কোনো ধর্মেই দুর্নীতির স্থান নেই। দেশীয় আইনে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার পাশাপাশি ধর্মীয়ভাবেও দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান তুলে ধরতে হবে। সর্বোপরি দুর্নীতির ভয়াবহতা রূখতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই আমরা বাংলাদেশকে সুখী সমৃদ্ধ ও সোনার বাংলা হিসেবে দেখতে পাবো।

#

০৮.১২.২০১৯ পিআইডি ফিচার